খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)

- মুহাম্মাদ তামীমুল ইসলাম

ভূমিকা :

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ছিলেন মুসলিম ইতিহাসে ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক মহান সেনাপতি। যিনি রণক্ষেত্রে নিজের শক্তি ও মেধার দ্বারা বাতিলের শক্তি মূলোৎপাটন করে তাওহীদের ঝান্ডাকে বুলন্দ করেছিলেন। মিসরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আববাস মাহমুদ আল- আক্কাদ 'আবকারিয়াতু খালিদ' নামক গ্রন্থে তাঁর সামরিক ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা করে বলেন, 'সামরিক নেতৃত্বের সব গুণাবলীই খালিদ (রাঃ)- এর মধ্যে ছিল। বাহাদুরী, সাহসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন, অত্যধিক ক্ষিপ্রতা এবং শত্রুর উপর অকল্পনীয় আঘাত হানার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় (তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, অনুবাদ : আব্দুল কাদের (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ; ১৯৯৪ খ্রিঃ, ১/১৮৮ পৃঃ)। নিম্নে এ কুশাগ্রবুদ্ধি মহান সেনাপতির সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হ'ল।

নাম ও জন্ম :

মূল নাম খালিদ, উপনাম আবু সুলায়মান ও আবুল ওয়ালীদ। লক্বব সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারী)। মূতার যুদ্ধে অসমান্য অবদানের জন্য তিনি 'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত হন।

খালিদের জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, নবুয়তের ১৫ অথবা ১৬ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। আর রাসূল (ছাঃ)- এর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় তাঁর ২৪ অথবা ২৫ বছর বয়স হয়েছিল।

বংশ পরিচয় :

পিতা ওয়ালিদ ইবনু মুগীরা। মাতা লুবাবা আস- সুগরা। যিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত ময়মুনা বিনতুল হারিছের বোন (আছহাবে রাসূল ২/৬৩ পৃঃ)। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর খালু। তিনি মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা হচ্ছে- খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখযুম আল- কুরাশী আল- মাখযুমী (আল- ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবা, ২/৯৮ পৃঃ)।

ইসলাম গ্রহণ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খালিদ ইবনু ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণের জন্য দো'আ করতেন। তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ খালিদ ইবনু ওয়ালিদ, সালামা ইবনু হিশাম এবং দুর্বল মুসলমানদেরকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্তি দান করুন'। এ দো'আর বরকতে আল্লাহ্র রহমতে ৭ম হিজরী সনে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ইসলাম গ্রহণ করেন (তাফসীর ইবনু কাছীর ১৬৩ পৃঃ)। তবে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আসমাউর রিজালের বিভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি ৮ম হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা সবার জানা কথা। এটা অষ্টম হিজরীর ঘটনা। অপর বর্ণনায় পাওয়া যায়, আমর হাবশা থেকে ফেরার পথে খালিদ এবং উছমান ইবন ত্বালহার সাথে সাক্ষাত হয় এবং তারা তিনজন একত্রে ইসলামের গ্রহণ করে। এতে বোঝা যায় এরা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ পাকই সবকিছু ভাল জানেন (আর- রাহীকুল মাখতূম ৩৫৭ পৃঃ)। হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালিদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)- এর হাতে বায়'আত গ্রহণকালে বলেছিলাম আল্লাহ্র পথে বাঁধা সৃষ্টি করে জীবনে যত পাপ করেছি হে আল্লাহ্র রাসূল (রাঃ) তা ক্ষমার জন্য দো'আ করুন। তখন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেছিলেন, 'ইসলাম অতীতের সকল গুনাহসমূহকে মুছে দেয়'। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমি এ কথার উপর বায়'আত করলাম (রিজালুন হাওলার রাসূল, ২৮৪ পৃঃ)।

ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণে খালিদ :

হিজরী নবম সনে রাসূল (ছাঃ) খালিদকে তাওহীদের দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে বনী জুজাইম গোত্রে প্রেরণ করেন। খালিদের দাওয়াতের ফলে বনী জুজাইম গোত্র ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ তারা তাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে না পারায় খালিদ তাদের ভুল বোঝেন। তিনি তাদেরকে হত্যার আদেশ দেন। ফলে সে গোত্রের বহুলোককে হত্যা করা হয়। রাসূল (ছাঃ) বিষয়টি অবহত হ'লে তিনি ভীষণ দুঃখিত হন। তিনি হাত উঠিয়ে দো'আ করেন, 'হে আল্লাহ খালিদ যা করেছে এ ব্যাপারে আমি দায়মুক্ত। অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)- কে সেখানে পাঠান এবং তাদের ক্ষতিপূরণ দেন। এমনকি তাদের নিহত প্রাণীগুলোরও ক্ষতিপূরণ দেন (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, পৃঃ ৪৫০)।

১০ম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খালিদ (রাঃ)- কে নাজরানের বনু আব্দিল মাদ্দাদের গোত্রে পাঠান। যেহেতু খালিদ বনু জুজাইমের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কঠিন ভুল করেছিলেন সেজন্য রাসূল (ছাঃ) এ যাত্রার পূর্বে তাকে বিশেষভাবে নছীহত করে বলেন, 'কেবল ইসলামের দাওয়াতই দিবে, কোন অবস্থাতেই তলোয়ার উঠাবে না। তিনি এ নছীহত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেন। তার দাওয়াতে মাদ্দান গোত্র ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়। এ সকল নওমুসলিমদের তিনি দ্বীনী তা'লীম ও তারবিয়াত শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)- এর দরবারে নিয়ে আসেন। একই বছরে ইয়ামানবাসীর নিকটে দাওয়াত প্রচারে খালিদ ও আলী (রাঃ)- কে পাঠান। তাঁদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইয়ামানবাসী ইসলাম গ্রহণ করে (আসহাবে রাসূল, ২/৬৬ পৃঃ)।

মূর্তি ভাঙ্গলেন খালিদ :

জাহেলী যুগে আরববাসীদের মূর্তিপূজার একটি অন্যতম কেন্দ্র ছিল উজ্জা। রাসূল (ছাঃ) খালিদকে ঐ কেন্দ্রীয় মূর্তিটি ধ্বংসের জন্য পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে নিমেণর পংক্তিটি আবৃতি করতে করতে তাকে মাটির সাথে গুড়িয়ে দেন, 'ওহে উজ্জা তুই অপবিত্র, আমরা তোকে অস্বীকার করি। আমি দেখেছি আল্লাহ তোকে অপমান করেছেন'।

সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তরবারী উপাধি লাভ :

মূতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপতিকে হারিয়ে মুসলিম বাহিনী যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন তারা খালিদ ইবন ওয়ালীদকে সিপাহসালার মনোনীত করেন। অতঃপর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে খালিদ অসীম বীরত্ব ও অপূর্ব দক্ষতা প্রদর্শন করে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর এই তেজস্বীতা ও বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তরবারী উপাধিতে ভূষিত করেন।

রণাঙ্গনে খালিদ :

খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের মাত্র দুমাস পরেই সর্বপ্রথম মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৬২৯ খৃষ্টাব্দের ২২ শে মার্চ মূতার যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যায়েদ ইবনু হারিছা (রাঃ)- কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি নির্দেশ দেন যায়েদ নিহত হ'লে জাফর আর জাফর নিহত হ'লে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে। যখন উভয়পক্ষের মাঝে তুমুল যুদ্ধ শুরু হ'ল তখন তিন সেনা কমান্ডারই অতুলনীয় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর জনতার মতামতের ভিত্তিতে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাঃ) সেনা কমান্ডার নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি অসীম বীরত্ব দেখিয়ে শত্রু পক্ষকে ছিন্নভিন্ন ও ছত্রভঙ্গ করে দেন। তিন তিনজন সুযোগ্য সেনা নায়ককে হারিয়েও মুসলমানরা অবশেষে বিজয় লাভ করেছিল (আর- রাহীকুল মাখতুম ৪০১- ৪০২ পৃঃ)। ছহীহ বুখারীতে স্বয়ং খালিদ ইবনু ওয়ালিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মূতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গেছে। এরপর আমার একটি ইয়ামানী তলোয়ার অবশিষ্ট ছিল (ছহীহ বুখারী, মূতার যুদ্ধ অধ্যায় ২/৭১১ পৃঃ)।

১০ম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের মূহূর্তে ছাহাবাগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন রাসূল (ছাঃ) খালিদকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন মক্কার ঢালু এলাকায় প্রবেশ করেন। নবী (ছাঃ) খালিদকে বলেন, যদি কুরাইশরা কেউ তোমার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তাহ'লে তুমি তাকে ক্বতল করবে। এরপর মক্কায় গিয়ে আমার সাথে দেখা করবে। খালিদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)- এর এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের পথে যেসব পৌত্তলিক বাঁধা হয়ে এসেছিল তাদেরকে মুকাবেলা করে হত্যা করেন। অতঃপর খান্দামা নামক স্থানে খালিদ ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে উচ্ছৃঙ্খল কতিপয় কুরাইশ পক্ষ মুখোমুখি হয়। কিছুক্ষণ সংঘর্ষ চলে। এতে বারো জন কুরাইশ নিহত হয়। এ ঘটনায় কুরাইশদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হাম্মাম ভয়ে ভীতু হয়ে ছুটে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। এভাবে খালিদ (রাঃ) মক্কার দক্ষিণাংশের সমস্ত বিপর্যয় অত্যন্ত

সাহসিকতার সাথে মুকাবেলা করে রাসূল (ছাঃ)- এর সাথে মিলিত হন (আর- রাহীকুল মাখতুম, ৪১৯ পৃঃ)।

ভন্ডনবীদের দমনে খালিদ :

রাসূল (ছাঃ)- এর ইন্তেকালের পর সমস্ত আরবে বিদ্রোহের দানা বাঁধতে থাকে। একদিকে ইসলাম ত্যাগকারী ও যাকাত অস্বীকারকারী, অপর দিকে ভন্ডনবীদের উৎপাত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই ফেৎনাবাজদের শিরদাড়া গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে আবূ বকর (রাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু বিশিষ্ট ছাহাবীদের অনুরোধে তিনি তা করেননি বরং মদীনাতেই রয়ে গেলেন। তিনি গোটা সেনাবাহিনীকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে ১টি ভাগের দায়িত্ব দিলেন খালিদকে। খালিদকে মদীনা থেকে বিদায় দেওয়ার সময় তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তোমার সম্পর্কে আমি রাসূল (ছাঃ)- কে বলতে শুনেছি, 'খালিদ আল্লাহ্র একটি তরবারী- যা আল্লাহ কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করেছেন। খালিদ আল্লাহ্র কতইনা ভাল বান্দা'(রিজালুন হাওলার রাসূল ২৯৩ পৃঃ)। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনা ত্যাগ করেন। সর্বপ্রথম তিনি ভন্ডনবী তুলায়হার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তুমুল যুদ্ধ চলছে। প্রতিটি সংঘর্ষে তুলায়হা পরাজয় বরণ করছে। এমন সময় তুলায়হা একদিন তার আপনজনদের জিজ্ঞাসা করল আমাদের এত বিপুল সৈন্য থাকতেও আমাদের এমন শোচনীয় পরাজয় কেন? তার সঙ্গীরা তাকে বলল, আমাদের প্রত্যেকেই চায় তাঁর সাথী আগে মারা যাক আর তারা প্রত্যেকেই চায় যে সে তাঁর সঙ্গীর আগে মৃত্যুবরণ করুক (হায়াতুছ ছাহাবা ৩/৬৯৩ পৃঃ)। অতঃপর খালিদ তুলায়হার সঙ্গী- সাথীদের হত্যা করেন এবং ৩০ জনকে বন্দী করেন।

তারপর তিনি মুসায়লামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। মুসায়লামা হামযা (রাঃ)- এর হত্যাকারী ওয়াহশী (রাঃ)- এর হাতে নিহত হয়ে চির বিদায় নেয় (আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ২/৬৭ পৃঃ)। 'তারীখুল খুলাফা' গ্রন্থকার বলেন, ভন্ড নবীদের ফিৎনা নির্মূল করার পর হযরত খালিদ (রাঃ) যাকাতদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ও মুরতাদদের দিকে ধাবিত হন এবং তাদের উপর কঠিনতর আঘাত হানেন। তাদের কিছু মারা যায় এবং কিছু ধৃত হয়। আর অবশিষ্টরা তওবা করে ইসলামে ফিরে আসে' (তারীখুল খুলাফা, ৭২ পৃঃ)।

অপরাজিত এক বীর সিপাহসালার খালিদ :

অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের পর খালিদ ইরাক অভিমুখে রওয়ানা দেন। আনবার, আইনুত তামুর, দুমা, হীরা ও সোনা প্রভৃতি অঞ্চল অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বিজয় লাভ করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) সর্বশেষ যুদ্ধ করেন ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে। ফোরাতের এক তীরে মুসলিম বাহিনী অপর তীরে ইরাকী বাহিনী। ইরাকীদের প্রস্তাবমতে তাদেরকে নদী পার হবার সুযোগ দিলে তারা নদী পার হয়। মুসলিম বাহিনী শত্রু বাহিনীকে তিন দিক ঘিরে ফেলে। তাদের পিছনে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা বিশাল নদী। সামনে মুসলিম সৈন্যদের তরবারীর ভেদ। পিছনে সুবিশাল সমুদ্র। পালানোর কোন পথ নেই। সামনে অতিক্রম করলে তরবারীর আঘাত আর পিছনে ফিরে গেলে ডুবে মরা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। অতঃপর মুসলিম বাহিনী শত্রু পক্ষকে কঠিনভাবে আক্রমণ করে। ফলে মুসলমানগণ

বিজয় লাভ করেন। পরিশেষে যুদ্ধ বিজয়ের পর খালিদ গোপনে হজ্জ করতে যান (আছহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৬৮ পৃঃ)।

ইরাক জয়ের পরপরই খালিদ (রাঃ) খলীফার নির্দেশে বসরায় যান ও পূর্বে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগদান করেন। খালিদ সেখানে পৌঁছেই বসরায় আক্রমণ করেন। তার আক্রমণে হতভম্ব হয়ে বসরাবাসী ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তাদের শান্তি চুক্তি করে। এরপর খালিদ সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। সিরিয়ায় অভিযানের প্রথমেই খালিদ দামেশক অবরোধ করেন। সেখানে খালিদ (রাঃ) প্রায় ছয়মাস অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারেন নি। এ সময় এক পাদ্রীর পুত্র সন্তান জন্মের কারণে আনন্দে নগরীর অধিবাসীরা মদপানে মত্ত ছিল। তাই সময় বুঝে একদিন রাতে খালিদ তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করেন ও দ্বাররক্ষীদের হত্যা করেন। ফলে নগরের প্রধান ফটক মুসলমানদের নিকট উন্মুক্ত হয়। অকস্মাৎ আক্রমণে ভীত হয়ে তারা তরিৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে। এ অভিযানে আবু ওবায়দা, আমর ইবনুল ‘আছ ও সুরাহবিল (রাঃ) খালিদকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন।

দামেশক বিজয়ের পর খালিদ (রাঃ) জর্দান অভিমুখে রওয়ানা দেন এবং জর্দানের নিকটবর্তী ফিহল নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন। রোমানরা সেখানে অযৌক্তিক প্রস্তাব সম্বলিত সন্ধি প্রস্তাব দেয়। মুসলমানরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে রোমানগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। দামেশক জর্দান ও হিমসের ন্যায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নগরের পতনে রোমান সম্রাট ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ২,৪০,০০০ জনের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন।

খালিদ ইবনু ওয়ালীদ যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান বিভিন্ন কমান্ডার পৃথকভাবে সৈন্য পরিচালনা করছেন। তখন খালিদ (রাঃ) যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে এক গুরুগম্ভীর ভাষণ প্রদান করেন। হামদ ও ছানার পর তিনি বলেন, ‘আজকে এ দিন আল্লাহ্র নিকট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। তোমরা গর্ব অহংকার থেকে বিরত থাক। তোমরা খালেছভাবে যুদ্ধ কর। তোমাদের কাজের জন্য প্রভুর সন্তুষ্টি কামনা কর। এসো আমরা নেতৃত্ব ভাগাভাগি করি। কেউ আজ কেউ আগামী ও কেউ পরশু আমীর হই। আর আজকের দিন আমার উপর ছেড়ে দাও’। অতঃপর তাঁর এই তেজোদীপ্ত বক্তব্য সকলে সমর্থন দিল। প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়ে খালিদ (রাঃ) মুসলিম সেনাদলকে এমনভাবে বিন্যস্ত করলেন যে আরবরা কোনদিন এমন বিন্যস্তকরণ চোখে দেখেনি (আছহাবে রাসূলদের জীবনকথা ২/৬৯)। অতঃপর তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। রোমানরা এমনভাবে আক্রমণ করল যে আরবরা এরকম বিপদে ইতিপূর্বে কখনও নিমজ্জিত হয়নি। মুসলিম বাহিনীর মাঝখানের দায়িত্বে ছিলেন কাকা ও ইকরামা (রাঃ)। খালিদ তাদেরকে ও সমস্ত মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। ফলে যুদ্ধ সর্বোচ্চ রূপ ধারণ করল। হযরত খালিদও তীব্র আক্রমণ চালালেন। তিনি যে দিক গেলেন সে দিকের রোমান বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাদের শোচনীয় পরাজয় হল।ঐতিহাসিক তাবারীর মতে, এ যুদ্ধে লক্ষাধিক রোমান সৈন্য নিহত হয়।

এরপর মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে। এ অবরোধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধানদের মধ্যে খালিদও ছিলেন একজন। বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিবাসীরা বাঁচার কোন পথ না পেয়ে স্বয়ং উমার

www.WaytoJannah.Com

(রাঃ)- এর নিকট সন্ধিচুক্তি করার প্রস্তাব দেন। তাদের অনুরোধে উমার (রাঃ) সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এভাবেই প্রত্যেক যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালীদের সুতীক্ষ্ম ও সাহসিকতাপূর্ণ নেতৃত্ব প্রদান করে ইসলামের বিজয় পতাকা বিশ্বের ময়দানে উড্ডীন করেন।

প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণঃ

খলীফা উমার (রাঃ) খালিদ (রাঃ)- কে ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেন। অতঃপর খলীফা ওমর (রাঃ) সর্বত্র ঘোষণা দেন যে, 'আমি খালিদকে আস্থাহীনতা, ক্রোধবশতঃ বা এ জাতীয় কোন কারণে অপসরণ করিনি। শুধুমাত্র এ কারণে পদচ্যুত করেছি যে, মুসলমানরা জেনে নিক যে, খালিদের শক্তির ওপর ইসলামের বিজয়সমূহ নির্ভরশীল নয়। বরং ইসলামের বিজয় আল্লাহর মদদ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল (ইবনুল আছীর, তারিখে কামিল, ২/৪১৮ পৃঃ)।

অপসারণের কারণঃ

তার অপসারেণের করণ সম্পর্কে ইতিহাসে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। প্রথমত, মুসলিম অমুসলিম সকলেই ধারণা করত যে, খালিদ বিন ওয়ালিদের কারণে প্রত্যেক যুদ্ধে বিজয় হচ্ছে। খলিফা এ কুধারণা দূর করার জন্য তাকে অব্যাহতি দেন (আছহাবে রাসূল ২/৭৩ পৃঃ)।

দ্বিতীয়ত, তাঁর অব্যাহতির ঘটনা কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, খালিদ (রাঃ)- এর ব্যয় কখনো কখনো সীমা অতিক্রম করত। মাঝে মাঝে তিনি বিপুল পরিমাণে সম্পদ দান করতেন। তিনি কবি আশ'আছ ইবনে ক্বায়েসকে ১০ হাজার দিরহাম দান করে দেন। খলিফা বিষয়টি অবগত হয়ে আবূ উবায়দাকে জিজ্ঞেস করতে বলেন, তিনি কোন খাত থেকে এ অর্থ ব্যয় করেছেন? তিনি উত্তরে বলেন নিজের অর্থ থেকে। তারপর তিনি খলীফার নির্দেশ পড়ে শোনান। অতঃপর খালিদ (রাঃ) বলেন, আমি খলীফার ফরমান শুনলাম ও মানলাম। কারো মতে এ ঘটনা ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলাকালে ঘটে (আছহাবে রাসূলের জীবনকথা, ২/৭২ পৃঃ)।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন :

খলীফার উক্ত অব্যাহতি আদেশ তিনি অবনত মস্তকে মেনে নেন এবং সাধারণ সৈনিক বেশে বাকি যুদ্ধে শরীক থাকেন। তারপর খলীফা তাকে সিরিয়ার রাহা, হিরাত, আমদ এবং লারতার অঞ্চলসমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন (আছহাবে রাসূলের জীবনকথা, ২/৭২ পৃঃ)। অতঃপর তিনি খলীফা প্রদত্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে দ্রুত সিরিয়ায় গমন করেন। তিনি ইয়াযীদকে লেবানন, আমর (রাঃ)- কে জেরুজালেম, সুরাহবিলকে জর্দান অভিমুখে পেরণ করেন এবং তিনি দ্রুত গতিতে বলবেক, এডেসা, আলেপ্পো, কিন্নিসিরিন প্রভৃতি স্থান দখন করে সমগ্র সিরিয়া অঞ্চলে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর এভাবে তিনি একজন সুদক্ষ সেনানায়ক থেকে একজন সুযোগ্য রাষ্ট্রীয় শাসকে পরিণত হন।

সেখানে কিছুদিন দায়িত্ব পালনের পর স্বেচ্ছায় অবসর নেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালিদ মাত্র ১৪ বছর জীবিত ছিলেন। এ অল্প সময়েই তিনি মোট ১২৫ মতান্তরে ৩০০ টি ছোট- বড় যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। তবে মজার বিষয় হল তিনি কোন যুদ্ধেই পরাজিত হননি (ইবনুল আছীর, তারীখে কামিল, ৪১৮ পৃঃ)।

ইলমে হাদীছে তাঁর অবদানঃ

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে প্রায় মৃত্যু অবধি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করেছেন। মহানবী (ছাঃ)- এর সান্নিধ্যে থাকার খুবই কম সুযোগ পেয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, জিহাদের ব্যস্ততা আমাকে কুরআনের বিরাট একটি অংশ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে (আল- ইছাবা, ৪১৫ পৃঃ)। তারপরেও তিনি এ শিক্ষা থেকে একেবারে বঞ্চিত থেকেছেন তা নয়। বরং তিনি রাসূল (ছাঃ)- এর সাথে যতটুকু সময় কাঁটাতে পেরেছেন তার সদ্ব্যবহার করেছেন। তিনি মোট ১৮ মতান্তরে ১৭টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহ হাদীছ ২টি এবং বুখারী এককভাবে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ফৎওয়া বিভাগে সাধারণত বসতেন না। তাই তার ফৎওয়ার সংখ্যা দুটির বেশি পাওয়া যায় না।

ইন্তেকালঃ

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) ৬৩৯ খ্রিঃ মোতাবেক হিজরী ২১ মতান্তরে ২২ সালে কিছুদিন অসুস্থ হন এবং ৬০ বছর বয়সে মদীনাতে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ‘হিমছ’- এ মৃত্যুবরণ করেন। তবে এ মত ঠিক নয় বলে ধারণা করা হয়। কারণ খলীফা উমর (রাঃ) তাঁর যানাযায় উপস্থিত হন বলে ধারণা করা হয় (উসদুল গাবা ১/৯৫)। খালিদের মৃত্যুতে উমার (রাঃ) আফসোস করে বলেছিলেন, ‘নারীরা খালিদের মত সন্তান প্রসবে অক্ষম হয়ে গেছে।’ এমন কি তাঁর মৃত্যুতে খলীফা নিজে কেঁদেছিলেন (রিজালুন হাওলার রাসূল, ৩০৫ পৃঃ)।

উপসংহারঃ

খালিদ (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের আসনে সমাসীন। সামরিক ক্ষেত্রে এবং রণাঙ্গনে তাঁর যে অবদান তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। পাশাপাশি এ কথাও স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে, তিনি একজন যোগ্য শাসকও ছিলেন। পরিশেষে ‘খালিদ সাইফুল্লাহ’ নামক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করছি। সেখানে বলা হয়েছে ‘আল্লাহ তা‘আলা খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)- এর উপর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ করেছেন। তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা ভুলবার নয়। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ, আমরা যেন তার জীবনীর বিভিন্ন ঘটনাবলীকে নিয়ে চিন্তা করি এবং নিজেদের মধ্যে তাঁর গুণাবলীর সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করি। কারণ মুসলিম জাতির তাঁর গুণাবলী অবলম্বনের মধ্যেই যথার্থ সার্থকতা নিহিত’। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!

Source :